#আমি পদ্মজা পর্ব ৮৬

_____
পদ্মজা রাম দা হাতে নিয়ে অন্দরমহল থেকে বের হলো। রাম দা থেকে চুইয়ে-চুইয়ে রক্ত পড়ছে। তার গায়ের সাদা শাড়িতে ছোপ-ছোপ রক্তের দাগ। লতিফা আড়চোখে পদ্মজাকে দেখছে। পদ্মজার শান্ত থাকা দেখে লতিফা বিস্ময়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ়! পদ্মজার হাঁটা দেখে মনে হচ্ছে মানুষ খুন করাটাই তার কাজ!
লতিফা নিজের কপালের ঘাম মুছে মিনমিনিয়ে বললো,' জসিমের লাশটা কিতা করাম?'
পদ্মজা কলপাড়ে পা রেখে শান্ত স্বরে বললো,' এতো বড় দেহ দুজন মিলে কিছুই করতে পারবো না। রিদওয়ান কুকুরটা ঘরে আছে না?'
লতিফার খুব ঘাম হচ্ছে। সে বিড়বিড় করে বললো,' তোমারে দেইখা আমার ডর লাগতাছে পদ্ম।'

লতিফার কথা পদ্মজার কানে আসতেই পদ্মজা হাসলো। বললো,’ তুমি কখনো খুন করোনি?’
পদ্মজা শীতল চোখে তাকায়। লতিফা মাথা নাড়িয়ে বললো,’না,করি নাই।’
‘শুধু দেখেছো?’
‘হ।’
‘রিদওয়ানকে গিয়ে বলো,পদ্মজা জসিমরে খুন করছে।’

কলপাড়ের এক পাশে সাদা রঙের বালতি ভর্তি পানি রয়েছে। পদ্মজা বালতির পাশে বসলো। পদ্মজার কথা শুনে লতিফার বুক ছ্যাঁত করে উঠে। সে দুই কদম এগিয়ে এসে চাপাস্বরে বললো,’ এইতা কিতা কও পদ্ম! রিদু ভাইজানে জানলে...’
লতিফাকে কথার মাঝে থামিয়ে দিয়ে পদ্মজা বললো,’কিছুই হবে না। বরং লাশটা সরিয়ে ফেলতে সাহায্য করবে।’

পদ্মজা রাম দা বালতির ভেতর রাখলো। সঙ্গে-সঙ্গে সাদা পানি লাল হয়ে উঠে। লতিফা কথা বলছে না,চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। সে দ্বিধাগ্রস্ত। পদ্মজা লতিফার চোখের দিকে তাকিয়ে বললো,' যা বলেছি করো বুবু।'

লতিফা জবাবে কিছু বললো না। সে উল্টোদিকে ঘুরে অন্দরমহলে চলে গেল। চারিদিকে অন্ধকার। তবে আকাশে চাঁদ আছে। জোনাকি পোকারা অনর্থক গল্প করে যাচ্ছে। তাদেরও কী পদ্মজার মতো শীত অনুভব হয় না? শিশির পড়ছে। মৃদু বাতাসও রয়েছে। তীব্র ঠান্ডায় মাটিও যেন কাঁপছে। শুধু কাঁপছে না পদ্মজা। শীতের দানব তার শরীর ভেদ করে ভেতরে ঢুকতে পারছে না। পদ্মজার বুকের ভেতর একটা উষ্ণ অনুভূতি ছুটে বেড়াচ্ছে। সেই উষ্ণ অনুভূতি শীতের দানবের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে।

রাম দা-এ লেগে থাকা জানোয়ারের রক্ত ধুয়ে পরিষ্কার করে দেয় পদ্মজা। তারপর অন্দরমহলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালো। অন্দরমহলের সদর দরজার দিকে ফিরে তাকাতেই রিদওয়ানের দেখা মিলল। রিদওয়ান তার দিকে ছুটে আসছে। চোখেমুখে ক্রোধ স্পষ্ট।

পদ্মজা মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়ালো। ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে রিদওয়ানকে স্বাগত জানালো। রিদওয়ান নিঃশ্বাসের গতিতে এক হাতে পদ্মজার গলা চেপে ধরে বললো,'বেশ্যা মা* মরার ইচ্ছে জাগছে তোর?'

পদ্মজা রিদওয়ানকে বাঁধা দিল না। সে ঠোঁটে হাসি ধরে রাখলো। রিদওয়ান পদ্মজার হাসি দেখে ভড়কে যায়। পরক্ষণেই রেগে গিয়ে আরো জোরে চেপে ধরে পদ্মজার গলা। কিড়মিড় করে বললো,' জন্মের মতো হাসি বন্ধ

করে দেব!’
পদ্মজার চোখ উল্টে আসতেই রিদওয়ান পদ্মজার গলা ছেড়ে দিল। পদ্মজা দুই-তিনবার কাশলো। তারপর রিদওয়ানের চোখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ শব্দ করে হেসে দিল!
রিদওয়ানের শরীর রাগে কাঁপছে। সে পদ্মজার ব্যবহারে হতভম্ব! পদ্মজার চোখেমুখে ভয়ের বিন্দুমাত্র ছাপ নেই! রিদওয়ান দ্রুতগতিতে অন্দরমহলে ভেতর চলে গেল। লতিফা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। রিদওয়ান চলে যেতেই লতিফা দৌড়ে আসে পদ্মজার কাছে।
লতিফাকে দেখে পদ্মজা কোনো কারণ ছাড়াই বললো,’ শিকার তাকে বলে যাকে আমরা হত্যা করার উদ্দেশ্যে আঘাত করি।’
লতিফা শুধু ড্যাবড্যাব করে চেয়ে রইলো।
খলিল টয়লেটে যাচ্ছিলেন,রিদওয়ানকে অস্থির হয়ে মজিদ হাওলাদারের ঘরের দিকে যেতে

দেখে তিনি থমকে দাঁড়ালেন। রিদওয়ান মজিদের ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো। দরজায় জোরে শব্দ করলো।
সে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছে। অস্থির হয়ে আছে। মজিদ হাওলাদার সবেমাত্র শুয়েছেন। দরজায় এতো জোরে শব্দ হওয়াতে খুব বিরক্ত হলেন। তিনি চোখে চশমা পরে দরজা খুললেন। ততক্ষনে খলিল হাওলাদারও সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি রিদওয়ানকে ডাকলেন,' রিদু আব্বা?'

রিদওয়ান ঘাড় ঘুরিয়ে খলিলকে একবার দেখলো। দরজা খোলার শব্দ হতেই সে সামনে তাকায়। মজিদ কিছু বলার পূর্বে রিদওয়ান দুই হাত ঝাঁকিয়ে মজিদকে বললো,'আমার কথা তো কোনোদিন শুনেন না।পদ্মজা কী করছে খবর রাখছেন?'
খলিল দুই তলায় উঠার সিঁড়িতে তাকিয়ে

বললেন,’ এই ছেড়ি আবার কোন কাম করলো?’
মজিদ উৎসুক হয়ে রিদওয়ানের দিকে তাকালেন। রিদওয়ান এক হাত দিয়ে অন্যে হাতের তালুতে থাপ্পড় দিয়ে বললো,’ খুন করছে...খুন। জসিমের গলা কেটে রান্নাঘরে ফেলে রাখছে।’
মজিদ ও খলিল চমকালেন! রিদওয়ান গলায় জোর বাড়িয়ে বললো,’ খুন করেও একদম স্বাভাবিক আছে। মনে ভয়ডর নাই। রাম দা হাতে নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। কতোটা ভয়ংকর হয়ে গেছে বুঝতে পারছেন কাকা? আপনার অনুমতি নাই বলে ওই মা** আমার সহ্য করতে হলো। নয়তো ওরে আমি কলপাড়েই গেঁথে আসতাম।’
মজিদ হাওলাদার কী বলবেন বুঝে উঠতে পারছেন না। আচমকা এমন একটা খবর পেয়ে তিনি অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছেন। রিদওয়ান গলার

জোর আরো বাড়ালো,’পদ্মজার হাতে অস্ত্র উঠে গেছে কাকা! অস্ত্র! ওদিকে আমিরের খবর নাই। পাতালঘরের দরজায় নতুন তালা দিয়ে চাবি নিয়ে ভেতরে বসে আছে। খাবারও কেউ নিয়ে যায় না,নিতেও আসে না। ভেতরে ও কী করতেছে তাও জানি না। ও নিজে মরবে আমাদেরও মারবে। পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। আমির-পদ্মজা দুজনই আমাদের জন্য হুমকি কাকা। বুঝতেছেন না কেন? আজকের ঘটনার পরও কি বুঝবেন না? সময় থাকতে আপনি দুজনের কবর খোঁড়ার অনুমতি দেন।’

বৃহস্পতিবার, দুপুর ১:৪০ মিনিট। পূর্ণা দুপুরের নামায আদায় করে লাহাড়ি ঘরের চেয়ে কিছুটা দূরে অবস্থিত গোলাপ গাছটির পাশে বসে রয়েছে। গোলাপ গাছটি তার ভীষণ প্রিয়। এই গাছটি তার মন খারাপের সঙ্গী,একাকীত্বের

সঙ্গী! প্রেমা পূর্ণার পিছনে এসে দাঁড়ালো। কিন্তু পূর্ণা টের পেল না। সে অন্যমনস্ক। তার ঠোঁটে লেগে আছে মিষ্টি হাসি। প্রেমা পূর্ণার কাঁধে হাত রাখে। পূর্ণা চমকে উঠে। প্রেমাকে দেখে বুকে তিনবার থুথু দিল। তারপর বললো,' ভয় দেখালি কেন?'
'কখন ভয় দেখালাম?'
'কখন ভয় দেখালাম হা?'
প্রেমা ভ্রুকুঞ্চন করলো। পূর্ণা বললো,' কী দরকার বল?'
পূর্ণার ব্যবহার দেখে বিরক্তি ধরে গেছে প্রেমার। সে তীব্র বিরক্তি নিয়ে বললো,'বড় আম্মা খেতে ডাকছে।'
'যা,আমি আসছি।'
'আমার সাথে আসো।'
পূর্ণা রাগ নিয়ে বললো,'যেতে বলছি,যা তো।'
'তুমি কী ভাবছিলে? মুচকি-মুচকি হাসছিলে

কেন?’
‘তোকে বলতে হবে?’
প্রেমা দৃঢ়কণ্ঠে বললো,’হ্যাঁ,বলতে হবে।’
পূর্ণা মোড়া ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। বললো,’তর্ক করবি না। থাপ্পড় দিয়ে দাঁত ফেলে দেব।’
‘সবসময় ঝগড়া করো কেন?’
‘আমি করি? নাকি তুই বেয়াদবি করে আমাকে রাগাস!’
প্রেমা গাল ফুলিয়ে চলে যেতে নিল,তখনই পূর্ণা চট করে প্রেমাকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরলো। প্রেমা পূর্ণাকে ধাক্কা দিয়ে সরানোর চেষ্টা করে বললো,’ছাড়ো। লাগবে না আমার আদর।’
পূর্ণা প্রেমাকে শক্ত করে ধরে রাখে। প্রেমার কাঁধে থুতুনি রেখে আহ্লাদী স্বরে বললো,’ কালতো সারাজীবনের জন্য চলেই যাব। রাগ করে না লক্ষী বোন।’

পূর্ণার কথা শুনে প্রেমা চুপ হয়ে যায়। ঘাড় ঘুরিয়ে পূর্ণার দিকে তাকালো। অবাক হয়ে প্রশ্ন বললো,'কোথায় যাবা?'
পূর্ণা ঠোঁট কামড়ে হাসলো। প্রেমা জোর করে পূর্ণার থেকে ছুটে যায়। একটু দূরত্ব রেখে দাঁড়াল। পূর্ণা সারাজীবনের জন্য চলে যাবে শুনে প্রেমা বিচলিত হয়ে পড়েছে। সে প্রশ্ন করলো,'বলো, কোথায় যাবা?'
পূর্ণা হাত দিয়ে ঢেউয়ের মতো করে বললো,'অনেক দূরে!'
'জায়গার নাম নেই?'
পূর্ণা হাসলো। তার চোখেমুখে খুশি উপচে পড়ছে। প্রেমার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙার পথে! পূর্ণা বললো,'বিকেলে জানতে পারবি।'
'এখন বললে কী সমস্যা? '
পূর্ণা হঠাৎ চোখমুখ কঠিন করে বললো,'বেশি কথা বলিস! আম্মা ডাকতেছে না খেতে? চল।'

‘কিন্তু...’
পূর্ণা প্রেমাকে ধাক্কা দিয়ে তাড়া দিল,’চল,চল।’
বারান্দায় পা রাখার পূর্বে পূর্ণা ঘাড় ঘুরিয়ে গেইটের দিকে তাকালো। তার ভেতরে-বাহিরে বসন্তের কোকিল কুহু কুহু করে ডাকছে। মনের বাগানে ফুটেছে শত রঙের ফুল। সেই ফুলের মিষ্টি ঘ্রাণে তলিয়ে যাচ্ছে সে। হারিয়ে যাচ্ছে বারংবার ফেলে আসা অনাকাঙ্ক্ষিত মধুর ক্ষণে। সেদিন পূর্ণা হাওলাদার বাড়ি থেকে ফিরেই মোড়ল বাড়ির উঠানে বসে পড়ে। হাঁটুতে মুখ গুঁজে কাটিয়ে দেয় মুহূর্তের পর মুহূর্ত! বাসন্তী অনেক বুঝিয়েছেন, যেন পূর্ণা ঘরে যায়। চারিদিক ছিল কুয়াশায় ঢাকা। কুয়াশার জন্য কয়েক হাত দূরের বস্তুও চোখে পড়ছিল না। এমতাবস্থায় পূর্ণা উঠানে, শিশিরভেজা মাটিতে বসেছিল। প্রেমা-প্রান্ত কেউ বুঝাতে পারেনি। বাসন্তী কেঁদে বলেছেন,’

আমি তোর আপন মা না এজন্যে আমার কথা শুনস না?’
তাতেও পূর্ণার ভাবান্তর হলো না। সে যে বসে আছে তো আছেই। পাথর হয়ে গেছে। না শীত,না বাসন্তীর কান্না কিছুই ছুঁতে পারেনি। বিচ্ছেদের যন্ত্রণা তাকে গ্রাস করে ফেলেছে। মা সমতূল্য বড় বোনের সাথে মনমালিন্য, ভালোবাসার পুরুষের সাথে বিচ্ছেদ কী করে সহ্য করবে? কী করে?...বুকের ভেতরটায় আগুন দাউদাউ করে জ্বলছে। সে কী করে তা বাসন্তীকে দেখাবে? সন্ধ্যার আযান পড়ার পরও যখন পূর্ণা ঘরে গেল না তখন বাসন্তী ও প্রেমা উঠানে পাটি এনে বিছালো। তারপর পূর্ণাকে প্রেমা বললো,’মাটিতে বসে থেকো না। পাটিতে বসো। কেন এমন করছো? বড় আপার সাথে কত খারাপ হলো! তার উপর তুমি এমন করছো!’
পূর্ণা আগের অবস্থানেই রইলো। “বড় আপার

সাথে কত খারাপ হলো” কথাটি শুনে তার দুই গাল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। বাসন্তী এবং প্রান্ত পূর্ণাকে টেনে পাটিতে নিতে চাইলে পূর্ণা চিৎকার করে কেঁদে বললো,’কী সমস্যা তোমাদের? আল্লাহর দোহাই লাগে,একটু শান্তিতে থাকতে দাও। নয়তো আমি কিছু একটা করে ফেলবো। আমি আত্মহত্যা করবো। আমার আর সহ্য হচ্ছে না!’
পূর্ণার রুদ্রমূর্তির সামনে বেশিক্ষণ টিকে থাকার সাহস কারো হলো না। পূর্ণা যে ধাঁচের মেয়ে সে নিজের ক্ষতি করতে দুইবার ভাববে না। বাসন্তী ঘরে এসে চাপাস্বরে কাঁদতে থাকলেন। তিনি আত্মগ্লানিতে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছেন। না পেরেছেন পদ্মজাকে অপবাদ থেকে বাঁচাতে,আর না পারছেন পূর্ণার কষ্ট কমাতে! সব ঘটনার জন্য তিনি নিজেকে দোষারোপ করছেন। বার বার মনে হচ্ছে, হেমলতা থাকলে এসব কিছুই হতো না। বাসন্তী মা হিসেবে নিজেকে ব্যর্থ মনে

করছেন! প্রেমা বাসন্তীকে কাঁদতে দেখেও দূরে দাঁড়িয়ে রইলো। তার নিজেরও বুক ভারী হয়ে আছে। গ্রামবাসী ছিঃ চিৎকার করছে। বাড়ি বয়ে এসে যা তা বলে যাচ্ছে। বড় বোন পদ্মজার সাথে মৃত মা হেমলতাকেও তারা ছাড়ছে না। সাথে মৃদুল-পূর্ণার নাম তো আছেই। কিশোরী এই ছোট মনে আর কতক্ষণ সহ্য ক্ষমতা ধরে রাখা যায়! প্রেমার চোখ দুটি ছলছল করে উঠে। চোখের জল গড়িয়ে পড়ার আগে দ্রুত মুছে ফেললো সে।

চারপাশ গাঢ় অন্ধকারে ডুবে গেছে। পূর্ণা উঠান ছেড়ে তার প্রিয় গোলাপ গাছটির পাশে এসে বসলো। গাছের পাতা আলতো করে ছুঁয়ে দিতেই দুই ফোঁটা শিশির ঝরে পড়ে মাটিতে। প্রেমা পূর্ণার জন্য অপেক্ষা করতে করতে বারান্দার ঘরে ঘুমিয়ে পড়েছে। বাসন্তী বারান্দার মুখে মোড়া নিয়ে বসে আছেন। পূর্ণাকে বাইরে

রেখে তিনি ঘরে থাকতে পারবেন না! নিজের অজান্তে একসময় চোখ লেগে যায়। প্রান্ত টয়লেটে যাওয়ার জন্য বের হয়েছিল। লাহাড়ি ঘরের চারপাশ অন্ধকারে তলিয়ে আছে দেখে সে এগিয়ে আসে। অন্ধকারের জন্য পূর্ণাকে তার চোখেই পড়ছে না। তাই সে রান্নাঘর গিয়ে একটা হারিকেন জ্বালিয়ে নিয়ে আসে। তারপর পূর্ণার পাশে এসে বললো,' আপা, ঘরে চলো।' পূর্ণা রুক্ষ চোখে তাকায়। কাঠ-কাঠ কণ্ঠে বললো,',যা এখান থেকে।'
তাও প্রান্ত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। এরপর পূর্ণার চেয়ে কিছুটা দূরে থাকা মুরগির খুপির উপর হারিকেন রেখে সে চলে যায়।

রাত গভীর থেকে গভীরত হয়। পূর্ণা গোলাপ গাছটি ছেড়ে লাহাড়ি ঘরের বারান্দায় যায়। সেখান থেকে আবার গোলাপ গাছের সামনে আসে। রাত বাড়ার সাথে কষ্টগুলো মাথাচাড়া

দিয়ে উঠছে। আক্ষেপের ভারে শরীর ভার হয়ে আসছে! লাল বেনারসি পরার স্বপ্ন কী স্বপ্নই রয়ে যাবে? পায়ে আলতা দেয়া হবে না? হবে না একটা সংসার? যে সংসারে মৃদুল হবে কর্তা সে হবে কর্তী! মৃদুল কেন তাকে বুঝলো না? মৃদুল কি তাকে ভালোবাসেনি? কখনো মুখফুটে কেন বলেনি ভালোবাসার কথা? অসহ্য যন্ত্রণায় তার ইচ্ছে হচ্ছে নিজের চুল ছিঁড়ে ফেলতে!
গা ছমছমে পরিবেশ। নিস্তব্ধতায় ঘিরে আছে চারপাশ। বৃষ্টির ফোঁটার মতো শিশির পড়ছে। লাহাড়ি ঘরের টিনের ছাদে টুপটুপ শব্দ হচ্ছে! পূর্ণার শরীর মৃত মানুষের মতো ঠান্ডা হয়ে গেছে। মৃদু কাঁপছেও। তবুও তার ইচ্ছে হচ্ছে না,ঘরে যেতে। হঠাৎ এক জোড়া পায়ের শব্দ কানে এসে ধাক্কা দেয়। পূর্ণা থমকে যায়। সে টের পায় কেউ একজন তার চেয়ে কয়েক হাত দূরে এসে দাঁড়িয়েছে। পূর্ণা চট করে উঠে দাঁড়ালো। ঘাড় ঘুরিয়ে আগন্তুককে দেখে তার

চোখেমুখে কোনো পরিবর্তন ঘটলো না। সে অন্যদিকে ফিরে তাকালো। তারপর আবার আগন্তুকের দিকে তাকালো। না সে সত্যি দেখছে! মৃদুল এসেছে! এই কুয়াশাজড়ানো রাত, টুপটুপ শিশির আর হারিকেনের হলুদ আলো স্বাক্ষী বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত মৃদুল ঘায়েল করা চাহনি নিয়ে তাকিয়ে ছিল পূর্ণার দিকে! সেই চাহনির তীরবিদ্ধে পূর্ণার বুকের স্পন্দন থেমে গিয়েছিল। থেমে গিয়েছিল শ্বাস-প্রশ্বাস! চোখের পলক পড়েনি দীর্ঘক্ষণ!

মৃদুল যখন অস্পষ্ট স্বরে ডাকলো,'পূর্ণা।' তখন পূর্ণার সম্বিৎ ফিরলো। সে আবিষ্কার করলো, মৃদুলের উপস্থিতি, মৃদুলের চাহনি তার মনের রাগ-ক্ষোভ পানি করে দিয়েছে! এ কেমন শক্তি! তবে মৃদুলের কণ্ঠ শুনে অভিমানের পাহাড়টা যেন মজবুত হয়ে

দাঁড়িয়েছে! অভিমানের ভারে পূর্ণা বাজখাঁই কণ্ঠে বললো,’ কী চাই?’

মৃদুল মাথা নত করে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। সে কোনো জবাব দিতে পারলো না। পূর্ণা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেও যখন উত্তর পেল না। তখন মৃদুলের পাশ কাটিয়ে চলে যেতে চায়,মৃদুল পথ আটকে দাঁড়ায়। তার মাথা নত।

পূর্ণা বললো,’ কী চান আপনি? এতো রাতে আমার বাড়িতে এসেছেন কেন? আপনার তো এতক্ষণে নিজের বাড়িতে থাকার কথা ছিল!’ মৃদুল কিছু বলতে চাইছে কিন্তু পারছে না, গলা আটকে আসছে। সে পূর্ণার চোখের দিকে তাকালো। তার চোখেমুখে অসহায়ত্ব স্পষ্ট! পূর্ণার বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠে। ফর্সা মানুষের এই এক সমস্যা, তারা কাঁদলে চোখমুখ লাল হয়ে যায়। তখন দেখে খুব মায়া

হয়। পূর্ণা গলার স্বর নরম হয়,’ কী বলবেন বলুন। বলে বিদায় হোন।’

কত নির্দয়ভাবে পূর্ণা বিদায় হতে বললো! মৃদুলের মনে হলো,এমন নিষ্ঠুর কথা সে আগে কখনো শুনেনি! সঙ্গে -সঙ্গে মৃদুলের চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ে। সে তার ভুলের ক্ষমা কী করে চাইবে বুঝতে পারছে না। সারাদিন সে অসহনীয় যন্ত্রণার মধ্যে কাটিয়েছে! হারে হারে টের পেয়েছে পূর্ণাকে শুধু মন নয়,তার সুখের চাবিও দিয়ে বসে আছে! কখন, কী করে তার এতোবড় ক্ষতি হয়ে গেল সে বুঝতেও পারেনি! ভেবেছিল,পূর্ণাকে এই মুখ আর দেখাবে না। কিন্তু রাতের আঁধার পাহাড়সম যন্ত্রণার সূচ নিয়ে যখন তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সে আর স্থির থাকতে পারলো না। উল্কার গতিতে হাওলাদার বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয়। সেখানে গিয়ে দারোয়ানের কাছে

জানতে পারলো, পূর্ণা নিজের বাড়ি চলে গিয়েছে। মৃদুল আর দেরি করেনি। কুয়াশার স্তর ভেদ করে ছুটে আসে প্রিয়তমার বাড়ি! কিন্তু এই মুহূর্তে মনের মণিকোঠায় জড়িয়ে রাখা প্রিয়তমাকে দেখে তার কথা হারিয়ে গেছে,হারিয়ে গেছে সত্ত্বা। নিজ সত্ত্বা হারিয়ে কাউকে ভালোবাসতে নেই! এ ক্ষতি কখনো পূরণ হয় না। কিন্তু প্রেমিক মন কি আর এতকিছু বুঝে! মৃদুলের চোখে পানি দেখে পূর্ণার গলা জড়িয়ে আসে। সে গোপনে ঢোক গিললো। মৃদুল তার কান্না আটকিয়ে বললো,' আমি তোমারে ছাড়া থাকতে পারবো না পূর্ণা।' পূর্ণা প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে উঠে। তখন মৃদুল তাকে অবজ্ঞা করে চলে গিয়েছিল,এখন সেও এর প্রতিশোধ নিবে! পূর্ণা বললো,' কিন্তু আমি আপনাকে চাই না। আমার সাথে যাকে মানায় না আমি তার ধারেকাছেও থাকতে চাই না।' পূর্ণার উচ্চারিত একেকটা শব্দ মৃদুলের বুক

ছিঁড়ে ফুটো করে দেয়। সে পূর্ণার দিকে এক পা বাড়িয়ে বললো,'আমি তহন বুঝি নাই। আমি...আমি আমার রাগ সামলাইতে পারি নাই।'
মৃদুলের কথার ধরণ এলোমেলো! সে ভীষণ অস্থির। সে যেন নিজের মধ্যে নেই! পূর্ণা এত সহজে নরম হওয়ার পাত্রী নয়। সে তার তেজ উর্ধ্বে রেখে বললো,'কৈফিয়ত দেয়ার জন্য কষ্ট করে কালো মেয়ের কাছে আসতে গেলেন কেন? রাতের কালো আঁধারে কালো মেয়েটাকে কি দেখা যাচ্ছে?'
মৃদুল কী বলবে,কী করবে বুঝতে পারছে না। আচমকা সে পূর্ণার কোমর জড়িয়ে ধরে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো। ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো। হঠাৎ যেন পাহাড়ের শক্ত মাটির দেয়াল ভেঙে ঝর্ণধারার বাঁধ ভেঙে গেল। পূর্ণার পায়ের তলার মাটি শিরশির করে উঠে। মাথা চক্কর দিয়ে উঠে। সর্বাঙ্গে ঠান্ডা স্রোত বয়ে যায়।

যেন মাথার উপর বরফের পাহাড় ধ্বসে পড়েছে। মৃদুল কান্নামাখা স্বরে বললো,’ আমি কখন এমন হইয়া গেলাম পূর্ণা! তুমি আমারে কোন নদীতে নিয়া ঝাঁপ দিলা। নদীর একূলও পাই না,ওকূলও পাই না। তুমি হাত ছাইড়া দিলেই মরণ! ধইরা রাখো আমারে!’
মৃদুলের আকুল আবেদন শুনে পূর্ণার বুকের পাঁজর ব্যথায় টনটন করে উঠে। তার অভিমানের পাহাড় মুহূর্তে ধ্বসে যায়। মৃদুল কখন তাকে এতো ভালোবেসে ফেললো? এই জাদু কখন হলো! এভাবে কোনো প্রেমিক কাঁদতে পারে! পূর্ণা মৃদুলের সামনে বসলো। তার চোখ দুটি আবারও জলে পূর্ণ হয়ে উঠে। সে মৃদুলের এক হাতে শক্ত করে ধরে। মৃদুল বললো,,’পূর্ণা আমি আর কুনুদিন এমন করতাম না। কুনুদিন না! এইবারের মতো মাফ কইরা দেও। যদি আর এমন করি তুমি আমারে আমার লুঙ্গি দিয়া শ্বাস আটকায়া খুন কইরো!’

মৃদুলের কথা শুনে পূর্ণার মনের আকাশের মেঘ কেটে যায়। সে মৃদুলের হাতের উপর কপাল ঠেকিয়ে হাসতে হাসতে কান্না করে দিল। বিচ্ছেদের পরের পূর্ণমিলন এতো মধুর হয় কেন? পূর্ণার ইচ্ছে হচ্ছে,মৃদুলকে নিয়ে দূরে কোথাও হারিয়ে যেতে!

শেষরাতের বাতাস সাঁ সাঁ করে উড়ছে। লাহাড়ি ঘরের বারান্দার চৌকিতে বসে আছে মৃদুল-পূর্ণা। দুজনের মাঝে এক হাত দূরত্ব। হাড় কাঁপানো শীত! পূর্ণা ঠকঠক করে কাঁপছে। মৃদুল মৃদু ধমকের স্বরে বললো,'কখন থাইকা কইতাছি,ঘরে যাও।'
পূর্ণা কাঁপছে ঠিকই তবে তার মুখে হাসি। সে ঠোঁটে হাসি ধরে রেখে বললো,' কাঁপতে ভালো লাগে আমার!'
'অসুস্থ হইয়া যাইবা তো। শরীর মরা মানুষের মতো ঠান্ডা হইয়া গেছে।'

‘কিছু হবে না।’
মৃদুল পূর্ণাকে দেখে অবাক হচ্ছে। একটা মানুষ এমন তীব্র ঠান্ডা কী করে সহ্য করতে পারে! ফজরের আযান পড়ার খুব বেশি সময় নেই। ফজরের আযানের পূর্বে মৃদুলকে তার আত্মীয়র বাড়িতে পৌঁছাতে হবে। ফজরের নামাযের পরই ট্রেন আসবে। মৃদল চৌকি থেকে নেমে বললো,’ আমি যাই এহন?’
মৃদুলের কণ্ঠে জড়তা। সে যেতে চাইছে না। পূর্ণা চৌকি থেকে নেমে মৃদুলের পাশে এসে দাঁড়ালো। মৃদুলের চোখের দিকে তাকিয়ে বললো,’ আসবেন তো?’
মৃদুল পূর্ণার খুব কাছে এসে দাঁড়ালো। পূর্ণার দুই গালে হাত রেখে বিভ্রম নিয়ে বললো,’ বৃহস্পতিবার বিকালের মধ্যেই আইসসা পড়ুম। আর শুক্রবার আমার এই রানির সাথে আমার নিকাহ হইবো।’
মৃদুল নিকাহ শব্দটা খুশিতে বাকবাকম হয়ে

উচ্চারণ করে। পূর্ণা বললো,'আপনার আম্মা রাজি না হলে?'
'পুরা দুইন্নারে এক পাশে রাইখা শুক্রবার আমি তোমারে বিয়া করাম। বিয়ার শাড়ি,গয়না সব নিয়া আসুম। তুমি খালি প্রহর গুণতে থাহো।'
পূর্ণার খুশিতে কান্না পাচ্ছে। তিনদিন পর সেও বউ সাজবে! মৃদুলের বউ হবে! সুদর্শন, বাউন্ডুলে,রাগী ছেলেটার বউ! ভাবতেই বুকের ভেতর শিহরণ বয়ে যাচ্ছে। মৃদুল আমুদে গলায় বললো,' এহন যাও, লেপের তলে ঢুইকা ঘুম দেও। তোমারে ধরছি না সাপরে ধরছি বুঝা যাইতাছে না। এত্ত ঠান্ডা! যাও ঘরে যাও।'
'টর্চ নিয়ে আসেননি? অন্ধকারে যাবেন কী করে?'
মৃদুল চুল ঝাঁকি দিয়ে ভাব নিয়ে বললো,' আমি মিয়া বংশের ছেড়া! দুইন্নাত এমন কিছু নাই যে আমার পথ আটকাইবো! যেমনে আইছি

ওমনেই যামু।’
পূর্ণা ফিক করে হেসে দিল।
গেইটের কাছাকাছি এসে পূর্ণা বললো,’ তাড়াতাড়ি আসবেন কিন্তু! আমি অপেক্ষা করব।’
মৃদুল হেসে মাথা নাড়াল। ইশারায় আশ্বস্ত করলো, সে তাড়াতাড়ি আসবে! গেইটের কাছে গিয়ে ফিরে তাকালো মৃদুল। বুকের ভেতরটা কেমন যেন করছে! মনে হচ্ছে কিছু একটা বলা হয়নি। সে কথাটি না বললে,বড় ভুল হয়ে যবে। মৃদুল পূর্ণার সামনে এসে দাঁড়ালো। খুব কাছাকাছি! পূর্ণাও উৎসুক হয়ে আছে। সেও কি যেন শুনতে চাইছে! মৃদুল তার শুকনো ঠোঁট জিভ দিয়ে ভেজাল। তারপর ডাকলো,’পূর্ণা?’
মৃদুলের কথার সাথে মুখ থেকে ধোঁয়া বের হয়। পূর্ণা স্থির হয়ে তাকিয়ে আছে। মৃদুল পূর্ণাকে একবার দেখলো তারপর লাহাড়ি ঘরের দিকে

তাকালো। তারপর আবার পূর্ণার দিকে তাকিয়ে বললো,'তুমি ছাড়া এই পৃথিবীর সুখ আমার জন্যে হারাম হইয়া যাক পূর্ণা!'
মৃদুলের প্রতিটা কথা এতো মধুর কেন মনে হচ্ছে পূর্ণার! তারা যেন নতুন কোনো জগতে চলে এসেছে। যেখানে শুধু সে, মৃদুল, প্রেম,প্রেম আর প্রেম! পরক্ষণেই মৃদুল বললো,'ভালোবাসি না কইলে হয় না? কইতেই হয়?'
পূর্ণা চোখে জল নিয়ে হেসে উঠে। তার রেশমি কালো চুল মৃদু বাতাসে উড়ছে। কুয়াশার আবছা আলোয় শ্যামবর্ণের পূর্ণাকে আবেদনময়ী মনে হচ্ছে৷ রাতের অন্ধকারের নিজস্ব ক্ষমতা আছে। রাত মানুষের মনের অনুভূতিকে সযত্নে জাগ্রত করে তুলে। মৃদলের উপর রাত তার নিজস্ব ক্ষমতা ফলায়! ফলস্বরূপ, মৃদুলের মনের জানালায় উঁকি দেয় নিষিদ্ধ সব আবদার! যখন মৃদুলের নিজের

মনের চাওয়া বুঝতে পারলো সে জোরে
নিঃশ্বাস ফেলে হঠাৎ বলে
উঠলো,’শয়তান,শয়তান!’
পূর্ণা হতভম্ব হয়ে যায়। সে চোখমুখ বিকৃত করে
বললো,’শয়তান কে? আমি?’
মৃদুল অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। সে বললো,’ না,না!
তুমি হইবা কেন?’
মৃদুল চোখ ঘুরিয়ে চারপাশ দেখতে দেখতে
আবার বললো,’দেখো,আমার চারপাশে শয়তান
ঘুরতাছে।
পূর্ণা মৃদুলের চারপাশ দেখে বললো,’কোথায়?
কীভাবে দেখলেন?’

মৃদুল অসহায় চোখে তাকায়। অনেকক্ষণ
তাকিয়েই থাকে। তারপর বললো,’আমার
তোমারে চুমু খাইতে ইচ্ছা করতাছে। এইটা তো
শয়তানের কাম!’
মৃদলের সহজ/সরল স্বীকারোক্তি। পূর্ণার কান

গরম হয়ে যায়। লজ্জায় চোখ নামিয়ে ফেলে।
মৃদুল অস্থির হয়ে বললো,’আমি যাইতাছি।’
কথা শেষ করেই মৃদুল ঘুরে দাঁড়ায়। গেইটের বাইরে যেতে যেতে দুইগালে থাপ্পড় দিয়ে কয়েকবার উচ্চারণ করলো,’
আসতাগফিরুল্লাহ,আসতাগফিরুল্লাহ!’
মৃদুল চোখের আড়াল হতেই পূর্ণা একা একা হেসে কুটি-কুটি হয়ে যায়।

পূর্ণা পায়ে আলতা দিয়ে প্রেমাকে বললো,’ভালো দেখাচ্ছে না?’
প্রেমা পূর্ণার উপর ভীষণ রেগে আছে। সে তীব্র বিতৃষ্ণা নিয়ে বললো,’ কথা বলব না তোমার সাথে।’
‘ওমা! আমি আবার কী করলাম?’
‘আম্মা এতো রান্নাবান্না করছে। আর তুমি পুরো বাড়ি নতুন করে গুছালে এখন আবার সাজতে বসেছো। কেন এসব হচ্ছে সেটা বলছো না!

কেন?’
পূর্ণা ঠোঁট টিপে হাসলো। দুই ডজন লাল কাচের চুড়ি দুই হাতে পরে বললো,’আমি কি আর কখনো সাজিনি?’
‘এবার আলাদা মনে হচ্ছে।’
‘সেটা তোর দোষ।’
‘আপা,বলো না।’
‘বিরক্ত করবি না তো।’
প্রেমা রাগে পায়ে গটগট শব্দ তুলে সোজা রান্নাঘরে চলে গেল। এখন সে বাসন্তীকে চাপ দিয়ে সব জেনে নিবে! প্রেমাকে রাগাতে পূর্ণার বেশ লাগে। সে নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলো। মৃদুল পূর্ণার আলতা দেয়া পা খুব পছন্দ করে! যতবার পূর্ণা আলতা দিয়েছে মৃদুল ততবার প্রশংসা করেছে। পূর্ণার নিজেকে প্রজাপতি মনে হচ্ছে। মুক্ত বিহঙ্গের মতো উড়ে বেড়াতে ইচ্ছে করছে যত্রতত্র। চোখ বুঁজলেই সেদিনের রাতটা ধরা দেয় ছবির মতন!

মৃদুল চলে যাওয়ার পরদিন সকালে উঠেই পূর্ণা পদ্মজার কাছে গিয়েছিল। দুই বোনের মন-মালিন্য শেষ হয়েছে। পূর্ণার মুখে সব শুনে পদ্মজা ভীষণ খুশি হয়েছে। মাঝে একদিনের বেশি সময় চলে গেল,পদ্মজার সাথে পূর্ণার দেখা হয়নি। তাই পূর্ণা সিদ্ধান্ত নেয় সে এখন হাওলাদার বাড়িতে যাবে। মৃদুলের জন্য অপেক্ষা করা সময়টা খুব বেশি দীর্ঘ মনে হচ্ছে। ওই বাড়িতে গেলে সময়টা কেটে যাবে, আর ফিরেই দেখবে মৃদুল চলে এসেছে! তাছাড়া আমিরের সাথে পূর্ণা সাক্ষাৎ করতে চায়। পদ্মজার অনিশ্চিত জীবনটা গুছিয়ে দেয়ার কোনো পথ আছে নাকি খুঁজতে হবে! পূর্ণা মাথায় ঘোমটা টেনে নিল। তারপর চিৎকার করে বাসন্তীকে বললো,'বড় আম্মা,আপার কাছে যাচ্ছি।'
রান্নাঘর থেকে বাসন্তীর জবাব আসে,'যাস না এখন।'

কিন্তু চঞ্চল পূর্ণা কী কারো কথা শুনার মেয়ে! সে দৌড়ে পালাতে চায়। গেইটের কাছে এসেই হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়। বড়ই কাঁটা পড়ে ছিল,সেই কাঁটা তেড়চাভাবে পূর্ণার হাতে প্রবেশ করে। কিঞ্চিৎ রক্ত বেরিয়ে আসে। তাতেও দমবার পাত্রী নয় সে। কাঁটা বের করে দ্রুত মোড়ল বাড়ি ছাড়লো! বেশ কিছুক্ষণ হাঁটার পর পূর্ণার মনটা হঠাৎ করেই বিতৃষ্ণায় ভরে উঠে। সে ঘাড় ঘুরিয়ে মোড়ল বাড়ির দিকে তাকালো। গাছগাছালির ফাঁকফোকর দিয়ে তাদের ঘরের ছাদ দেখা যাচ্ছে!

চলবে...